

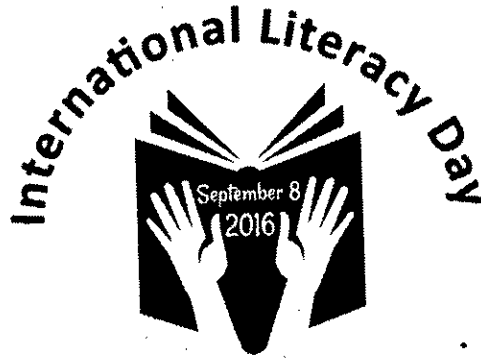
আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও আমাদের করণীয়

একরাম উদ্দীন সুমন

আজকের আধুনিক দুনিয়াতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হলেও সমস্ত দুনিয়ার সমগ্র মানুষ আজও শিক্ষার আলো গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকি নিজের পরিচয়ও লিখতে পারে না লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাদের সাক্ষরতা দানের উদ্দেশ্যে ইউনেস্কো ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৬৫ সালের ৮-১৯ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর উদ্যোগে ইরানের তেহরানে বিশ্ব সাক্ষরতা সম্মেলন হয়। ওই সম্মেলনে প্রতিবছর ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের প্রস্তাব করা হয়। পরে ১৯৬৫ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ৮ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। আর ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কো প্রথম দিবসটি উদ্‌যাপন করলেও ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'Reading the past, writing the future' অর্থাৎ 'অতীতকে জানব, আগামীকে গড়ব'। পৃথিবীর সব মানুষকে নিজেদের অন্যতম মৌলিক অধিকার শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই মূলত এই দিনটির প্রচলন হয়েছে। সারা বিশ্বে লক্ষ করলে দেখা যায় সাক্ষরতা হার যাদের বেশি বৈশ্বিক উন্নয়নে তারা ই এগিয়ে। সাক্ষরতা আর উন্নয়ন দুটোই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। সাক্ষরতাই টেকসই সমাজ গঠনের মূল চালিকাশক্তি। টেকসই সমাজ গঠনের জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তা সাক্ষরতার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সাক্ষরতা বলতে সাধারণত অক্ষর জ্ঞানসম্পন্নতাকে বোঝানো হলেও বর্তমানে এর সংজ্ঞা আরও ব্যাপক। এখন এর সঙ্গে জীবনধারণ, যোগাযোগের দক্ষতা ও ক্ষমতায়নের দক্ষতাও সংযোজিত হয়েছে। তাই দিবসটি যথাযথভাবে পালনের গুরুত্ব রয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই ইউনেস্কো প্রদত্ত সাক্ষরতার সংজ্ঞা ব্যবহার করে, সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এটি একটি ন্যূনতম সংজ্ঞা এবং অনেক উন্নত দেশ এর চেয়ে কঠিন সংজ্ঞা নিজ দেশের সাক্ষরতাকে বিবেচনা করে। দেশে দেশে সাক্ষরতার সংজ্ঞা অনেক আগে থেকে প্রচলিত থাকলেও ১৯৬৭ সালে ইউনেস্কো প্রথম সাক্ষরতার সংজ্ঞা প্রদান করেছে। একসময় কেউ নাম লিখতে পারলেই তাকে সাক্ষর বলা হতো কিন্তু বর্তমানে সাক্ষর হিসেবে তাকে বলা হয় যে তিন শর্ত পালনে সক্ষম। প্রথমত যে ব্যক্তি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোট বাক্য পড়তে পারবে, সহজ ও ছোট বাক্য লিখতে পারবে এবং দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ হিসাবনিকাশ করতে পারবে। এই প্রত্যেকটি কাজই হবে ব্যক্তির প্রাথমিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সারা বিশ্বে বর্তমানে এই সংজ্ঞাকেই ভিত্তি করে সাক্ষরতার হিসাব করা হয়। ১৯৯৩

সালে ইউনেস্কো এই সংজ্ঞাটি নির্ধারণ করে, তবে বর্তমানে এটিও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এখন বলা হচ্ছে সাক্ষরতা হলো সরাসরি ব্যক্তির জীবনমান পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। পৃথিবী যখন প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছে তখন শত সত্তাবনা থাকার পরও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের জনসংখ্যার বিশাল একটি অংশ এখনো নিরক্ষরতার বেড়া জালে বন্দি। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের দেশে বর্তমানে সাত ও এর চেয়ে বেশি বয়সী শিক্ষিতের হার ৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ (পুরুষ ৫৯ দশমিক ৮ ও মহিলা ৫৩ দশমিক ৯) এবং ১৫-এর চেয়ে বেশি বয়সী শিক্ষিতের হার ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ (পুরুষ ৬২ দশমিক ৯ ও মহিলা ৫৫ দশমিক ৫)। মোট জনসংখ্যার বিশাল একটি অংশ এখনও নিরক্ষরতার ঘানি বয়ে বেড়াচ্ছে—খাদের অধিকাংশই অধিকারবঞ্চিত এবং



দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র বন্দি জীবন-যাপন করছে। এই দারিদ্র্যের মূল কারণই হচ্ছে শিক্ষা এবং কারিগরি দক্ষতার অভাব। শিক্ষার সঙ্গে সাক্ষরতার আর সাক্ষরতার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে দেশের সাক্ষরতা হার যত বেশি সে দেশ তত উন্নত। বঞ্চিত এবং নিরক্ষর শিশু-কিশোর এবং যুবকদের শিক্ষার মাধ্যমে দেশের জনসম্পদে পরিণত করা দরকার। তাই নিরক্ষরতার অভিযোগ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে যার যার অবস্থান থেকে সকলকে এগিয়ে আসা জরুরি। নিরক্ষরতা, ক্ষুধা দারিদ্র্য ও দুর্নীতি এক একটি হানাদার শত্রুর মতো। এই শত্রুকে হত্যা করতে যে অস্ত্র দরকার তা হচ্ছে শিক্ষা ও সাক্ষরতা। এজন্য চাই

সবার জন্য শিক্ষা। চাই নিরক্ষরমুক্ত, শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল আধুনিক বাংলাদেশ। আসুন আমরা সমাজ এবং দেশের টেকসই উন্নয়নে কাঁধে কাঁধ মিলাই এবং আলোকিত সমাজ গড়ি। আগামীর সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন বুনি।

বিশ্বের মানচিত্রে একটি সুশিক্ষিত এবং উন্নত জাতি হিসেবে দৃঢ় অবস্থান তৈরি করি। আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিক এক একটি জনসম্পদ। অপার সত্তাবনার এই জনসম্পদকে শিক্ষিত, নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারলেই সফলতা। নিরক্ষরতার হাত থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে ও সরকারের প্রতি আহ্বান পৌঁছে দিয়ে দিবসকে যথাযথভাবে পালনের জন্য বেশকিছু কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। যেমন ১. গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা বা বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া ২. প্রত্যেকে নিজ উদ্যোগে পাঁচজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে অক্ষরজ্ঞান দান নিশ্চিত করা ৩. সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি অনুপ্রাণিত করা ৪. গ্রামের শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের নিয়ে শিক্ষা সচেতনতামূলক বিভিন্ন সভা-সেমিনার করা ৫. শিক্ষার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে লিফলেট বিতরণ অথবা পোস্টারিং করা ৬. গ্রামের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ করা এবং প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রদান করা ৭. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে শিক্ষা সচেতনতামূলক লেখালেখি করা ৮. বেকার এবং নিরক্ষর যুবকদের নিয়ে কারিগরি শিক্ষা এবং কর্মশালার আয়োজন করা ৯. বয়স্ক শিক্ষার হার বাড়াতে নিজ এলাকাতে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা ১০. পথশিশুদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা এবং বৃত্তি প্রদান অথবা খাবারের বিনিময়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা ১১. শিক্ষানীতির আলোকে সাক্ষরতা দানের উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্মসূচি প্রণয়ন করে নারী, কন্যাশিশু, পথশিশু, চর-হাওর, দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন এলাকা, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, অনাথ ও ভবঘুরে এবং এ সমাজের তরুণদের জন্য আধুনিক ও মানসম্মত এবং নৈতিকতা সম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যদি বাংলাদেশকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকর রাষ্ট্র তৈরি করতে চাই, তা হলে অবশ্যই সাক্ষরতা দিবসকে সামনে রেখে নিরক্ষরদের সাক্ষর জ্ঞানে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ যুগেও টিপ দেওয়ার প্রথা রয়েছে? অবশ্যই সরকারকে মাস্টার প্লান নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে এ সমাজকে। তাহলে এই দেশ একদিন সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবেই হবে।

● লেখক: পিএইচডি গবেষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়